যুগান্তর

দেশপ্রেমের চশমা: শিক্ষক রাজনীতি হল যত নষ্টের গোড়া

প্রকাশ : ১০ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বাংলাদেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে এর গণতন্ত্র। ভেঙে পড়েছে সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নির্বাচন ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ঘটেছে মানের অবনমন।

সব অসুস্থতা সম্পর্কে এক প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে আমরা শিক্ষাঙ্গনের অসুস্থতা বিষয়ে আলোচনা করব। এ আলোচনায় উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অসুস্থতা তুলে ধরব। কেন অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অসুস্থতা আলোচনা না করে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসুস্থতার আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হবে সে সম্পর্কে বলে নেয়া ভালো। দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মানের অবনমন হলে আর শিক্ষাঙ্গনের দোষ কী?

শিক্ষাঙ্গন তো আর দেশের বাইরের কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। তবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মান হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনের মান কমে যাওয়ার একটা বড় পার্থক্য আছে। কারণ, শিক্ষাঙ্গন থেকে ডিগ্রি অর্জন করে গ্র্যাজুয়েটরা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন শুরু করেন। কাজেই এখান থেকে যদি তাদের নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতা, সততা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শেখানো যায়, তাহলে তারা পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে এসবের চর্চা অব্যাহত রাখতে পারেন। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজটি সবচেয়ে বেশি জরুরি। আর সেজন্যই অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অবনমন নিয়ে আলোচনার আগে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান নৈরাজ্য নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সাড়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে একটি বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। আর কয়েক বছর পর শিক্ষকতা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ দীর্ঘ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমার কাছে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অসুস্থতা ও নৈরাজ্যের মূল কারণ হল একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতির নামে জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির চর্চা। আমি স্বীকার করছি, যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি এমন মন্তব্য করছি সে অভিজ্ঞতা অন্য অনেক শিক্ষকের অভিজ্ঞতার চেয়ে কম। কারণ, অন্যসব সম্মানিত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্ষদে কাজ করে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ওইসব পর্ষদের পদ-পদবি ও দায়িত্ব বঞ্চিত হয় দলীয় বিবেচনায়। আর আমি যেহেতু দলহীন একজন বর্ণহীন শিক্ষক, কোনো বর্ণদলে কখনও নাম লেখাইনি, তাই সঙ্গত কারণে আমাকে কখনও এসব দায়িত্ব দেয়া হয়নি। ক্ষমতাসীন বর্ণদলীয় শিক্ষক নেতারাই এসব দায়িত্ব নিজ বর্ণদলীয় শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করেন। ফলে এসব পদে কাজ না করায় আমার অভিজ্ঞতায় ঘাটতি আছে। এভাবেই বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্ষদে কাজ না করলেও আমার তো একজন শিক্ষক হিসেবে পর্যবেক্ষণ যোগ্যতা আছে। সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময় শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে। বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু রুটিন দায়িত্ব পালন করেও কিছু জেনেছি ও শিখেছি। এ অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি যা বুঝেছি তা হল, বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর সবকিছুই চলে রাজনৈতিক বিবেচনায়। একাডেমিক যোগ্যতার চেয়ে এখানে রাজনৈতিক বর্ণ পরিচয়ের মূল্য অনেক বেশি। আর এ রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতেই ভিসি থেকে শুরু করে সব গুরুত্বপূর্ণ ও রেমুনারেটিভ পদে ক্ষমতাসীন বর্ণদলীয় সম্মানিত শিক্ষকদেরই নিয়োগ দেয়া হয়।

একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির প্রভাব যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভাবমূর্তি ধ্বংস করে দিচ্ছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানের সূচকেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক সম্মানিত শিক্ষক ভুল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সূচকে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান খুঁজতে গিয়ে গলদঘর্ম হন। তারা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়েও অনেক ক্ষেত্রে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পান না। অথচ এসব শিক্ষক যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ওই সূচকের প্রথম থেকে না খুঁজে একেবারে নিচ থেকে উপরের দিকে খোঁজা শুরু করেন, তাহলে কিন্তু তাদের পরিশ্রম লাঘব হয়ে যাবে। তখন তারা কয়েক সেকেন্ডে বা মিনিটেই এ দেশের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে খুঁজে পাবেন।

একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবকিছু যে রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়, সে বিষয়টি আমার অনেক আগে শোনা একটি গল্পের সঙ্গে মিলে যায়। গল্পটি এ রকম : মফস্বল শহরের এক উকিল সাহেবের একটি মুদ্রাদোষ ছিল। কোনো মক্কেল মামলা করতে এলে তিনি প্রথমে তাকে একটি প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নটি হল- 'মেয়েটি কে?' তারপর দেখা যেত ওই মামলার মধ্যে একটি মেয়ে থাকত। কিন্তু একবার এক মক্কেল এলে তিনি একই প্রশ্ন করায় ওই ক্লায়েন্ট বললেন, উকিল সাহেব এর মধ্যে কোনো মেয়ে নেই। আমার জমি আমার জ্ঞাতি ভাইরা আইল ঠেলে কিছুটা দখল করে নিয়েছে। এটি উদ্ধার করতে হবে।

উকিল সাহেব বললেন, আমার ২৭ বছরের ওকালতি প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা কি আপনি মিথ্যা প্রমাণ করতে চান? এ কথা বলে তিনি তাকে জেরা শুরু করলেন। একপর্যায়ে ঠিকই দেখা গেল, অনেক আগে এ জমিসংক্রান্ত এক মামলা হয়েছিল এবং সেখানে তার এক আত্মীয়া জড়িত ছিলেন। তেমনি ঠিক একইভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যত লাশ পড়তে দেখি, যত অনিয়ম দেখি, যত চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি দেখি, যত অঘটন ও নৈতিক অধঃপতন দেখি, মানের অবনমন ও সুশাসনের স্খলন দেখি- এর সবকিছুর মূলে কারণ মাত্র একটি। আর তা হল জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির চর্চা। এ দলীয় রাজনীতিতে শিক্ষার্থীরা যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত শিক্ষকরাও।

তবে আমার বিবেচনায় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিতে শিক্ষার্থীদের জড়িত হওয়া যতটা ক্ষতিকর, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর শিক্ষকদের জড়িত হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় হল লেখাপড়ার স্থান। জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান বিতরণের জায়গা। সেখানে লাশ পড়বে কেন? সন্ত্রাস হবে কেন? চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি-দখলবাজি থাকবে কেন? টর্চার সেল গড়ে উঠবে কেন? জলকামান থাকবে কেন? সরকারের প্রয়োজন হলে শিক্ষককে ডাকবেন। শিক্ষক কেন লেখাপড়া ও গবেষণা বাদ দিয়ে পদ-পদবির জন্য তদবিরে যাবেন?

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অবশ্যই রাজনীতি করার অধিকার আছে। তিনি যদি এমপি হতে চান, মন্ত্রী হতে চান, তাতে কোনো বাধা নেই। শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার ফুলটাইম রাজনীতি করার সাংবিধানিক অধিকার আছে। কিন্তু শিক্ষকতায় জড়িত থেকে ক্যাম্পাসের একাডেমিক পরিবেশে লাল, নীল, গোলাপি, সাদা বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতি করার কাজটি কতটা রাজনীতির বা শিক্ষার জন্য উপকারী সে বিষয়ে ভাবার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় তো বিশ্বের সব দেশে আছে।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি সম্মানিত শিক্ষকরা এভাবে ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির চর্চা করেন? পদ-পদবির জন্য, ভিসি হওয়ার জন্য তদবির করেন? না, করেন না। তারা রাজনৈতিক কাজের পরিবর্তে একাডেমিক কাজে মনোযোগী থাকেন। লেখাপড়া ও গবেষণার চাপে তারা দলীয় রাজনীতি করার সময় পান না। তবে হ্যাঁ, সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকদের সমিতি আছে। শিক্ষকদের একাডেমিক স্বার্থ নিয়ে সে সমিতি প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। শিক্ষকদের স্বার্থ দেখভাল করে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের অনেকেই বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করে ক্যাম্পাসের একাডেমিক পরিবেশ কলুষিত করেন। আর যখন শিক্ষকদের রাজনীতি ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে মিলেমিশে যায়, তখন আর শিক্ষকতার পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার অহঙ্কার বলে কিছু থাকে না। শিক্ষক ও ছাত্রদের ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি চর্চার সমালোচনা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন বক্তৃতায় সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেছিলেন, 'যেসব শিক্ষক দলীয় রাজনীতিতে জড়িত, তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি, একটু ভেবে দেখুন, সক্রিয় রাজনীতিতে আপনাদের সংশ্লিষ্টতা শিক্ষার উপকারে এসেছে, না তাতে রাজনীতির কোনো উপকার হয়েছে? সক্রিয় দলীয় রাজনীতিতে জড়িত ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিবেদন করি, জাতির মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে; কিন্তু এ মাহেন্দ্রক্ষণ কি অনন্তকাল চালু থাকে?'

বড় চারটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ হবে না। কারণ, যে ১৯৭৩-এর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় সে অধ্যাদেশ/আইন অনুযায়ী ডিন, ভিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। আর এসব নির্বাচনী মনোনয়ন দলীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয়। একাডেমিক যোগ্যতাকে এখানে প্রাধান্য দেয়া হয় না। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একাডেমিক পারফরমেন্স দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের দলীয় স্বার্থের দিকে খেয়াল রেখে কথাবার্তা বলতে হয়। তবে শিক্ষক রাজনীতি জিইয়ে থাকার জন্য আমি যতটা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়ী করব, তার চেয়ে বেশি দায়ী করব সরকারকে। কারণ, সরকার এ বিষয়ে সবসময় দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। সরকার মুখে বলে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করা উচিত নয়। তাদের লেখাপড়া ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত। আবার যখন কোনো বড় পদে ডেপুটেশনে কোনো অধ্যাপককে নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন হয়, তখন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে ভালো করে তার বর্ণ পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে কিছুতেই তাকে নিয়োগ দেয় না। সরকারের এহেন দ্বিমুখী ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করাকে উৎসাহিত করে।

কাজেই ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে যুগোপযোগী না করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি চর্চা কমানো যাবে না। তাদের মধ্যে একাডেমিক প্রতিযোগিতা বাড়ানো যাবে না। কমানো যাবে না পদ-পদবি ও ভিসি-প্রোভিসি হওয়ার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে তদবিরের প্রতিযোগিতাও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিনেট নির্বাচনকে অবজ্ঞা করে তদবিরের ওপর ভিত্তি করে দলীয় শিক্ষককে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। এমন লোককেও সরকার ভিসি নিয়োগ দেয়, যিনি ভিসি হওয়ার চেয়ে সরকারি দলের যুবসংগঠনের সভাপতি হওয়াকে শ্রেয় মনে করেন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকরা তাদের একাডেমিক স্বার্থ দেখভালের রাজনীতি করেন না। তারা বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতির চর্চা করেন। লেখাপড়া ও গবেষণায় মনোযোগী না হয়ে তাদের অনেককে ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্রের মতো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রেণিকক্ষে; গবেষণা, প্রকাশনা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, সেশনজট নিরসন এবং গ্র্যাজুয়েটদের মানোন্নয়নে। কাজেই শিক্ষকদের মধ্যে একাডেমিক চর্চা ও গবেষণার প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অকার্যকর ও পদে পদে লঙ্ঘিত ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করা এখন সময়ের দাবি। আমরা যদি জাতির প্রয়োজনে পবিত্র সংবিধানকে ১৬ বার পরিবর্তন করতে পেরে থাকি, তাহলে শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব সৃষ্টি এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইনকে কেন পরিবর্তন করে সময়োপযোগী

করতে পারব না? সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিকে শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাপ্রেমী সম্মানিত শিক্ষকদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসে আলোচনা করার অনুরোধ করছি।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

akhtermy@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।